লেখায় তিনি ছিলেন সমান অক্লান্ত। পরিণত বয়সে ১৯৯৮ সালে চিরবিদায় নিলেন অমলেশ ত্রিপাঠী। তাঁর অনুজ ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরী, যাঁকে যথার্থই আখ্যা দিয়েছেন 'রেনেশাঁস ম্যান' হিসাবে। ডঃ ত্রিপাঠীর চিরবিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটলো ইতিহাস জগতের এক উজ্জ্বল যুগের।

আরও বিস্তারিত তথ্যর জন্য দ্রষ্টব্য :

১। প্রণব চট্টোপাধ্যায়— 'আমার শিক্ষক ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী' (দে'জ পাবলিশিং প্রকাশিত 'আমার শিক্ষক' প্রবন্ধমালার অন্তর্ভুক্ত), কলকাতা ২০১০।
২। অর্পিতা গায়েন—'ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী ও তাঁর ইতিহাস চেতনা : ১৯২১-১৯৯৮', এম.ফিল. গবেষণা সন্দর্ভ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৯।
৩। অরুণ দাশগুপ্ত সম্পাদিত *ঐতিহাসিক* পত্রিকা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৮।
৪। নির্বাণ বসু—'শিক্ষক ও ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠী', *কোরক সাহিত্য পত্রিকা*, প্রাক্-শারদ, ২০১২ ('শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষকতা' বিশেষ সংখ্যা)।

দিলীপকুমার বিশ্বাস : শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি

দেবব্রত চক্রবর্তী

এত বড় একজন মানুষের জন্মশতবর্ষে আমরা ছাত্ররা তাঁর স্মৃতিতর্পণ করবো না সে কি করে হয়? কিন্তু বছর আসবার আগেই বিষম বিপত্তি শুরু হয়ে গেল। এনআরসি, এনপিআর, আরও কত কিছু! আর তার ঠিক পরই পরই করোনা। যুগান্তরের গ্লানি এসে পড়েছে দোরগোড়ায়, তাকে তো আগে সামাল দিতে হবে!

তাই তাঁকে নিয়ে নমো নমো করে এই শ্রদ্ধা জানাবার চেষ্টা। প্রস্তাবে সম্পাদক সম্মত হলেন, তাই তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

যদিও কলেজে পড়বার সময় আমি তাঁর ইতিহাস ক্লাসের ছাত্র ছিলাম না, তবু জীবনের পরবর্তী সময়ে যখন যোগাযোগ হলো, তখন তাঁর সঙ্গে আমার অধ্যাপক-ছাত্রের দূরত্ব রইলো না আর। নাড়া বেঁধেছিলাম অবিশ্যি তাঁর কাছে পিএইচডি-র জন্য। তবে সেকথা এখানে বলবার নয়। প্রেসিডেন্সি থেকে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগের প্রধান হয়ে সংস্কৃত কলেজে এসেছিলেন আমাদের পাঠের প্রায় শেষদিকে, ১৯৬৯-এ। কিন্তু সখ্য হলো গিয়ে আমি যখন ১৯৮৪-তে পাইকপাড়া অঞ্চলে বাস করতে এলুম।

অনেকে তাঁর বৈদগ্ধ্য নিয়ে অনেক কথা বলবেন, ওসব নিয়ে বলতে আমি খুব একটা উৎসাহ পাই না। ভাবি মানুষটাই তো কত বড় তাঁর লেখা বইয়ের চেয়ে। আর আমি তাঁকে যেভাবে দেখেছি, তাতে একটি নিটোল আড্ডাবাজ, ঘরোয়া আটপৌরে মানুষকে নিয়ে কথা বলবো নাই বা কেন? যদি ছবি আঁকবার চেষ্টা করি, তাহলে সে ছবিটা হবে তাঁরই আনন্দঘন মূর্তি। কিন্তু সেটাই কি সোজা নাকি? ছড়ানো তাঁর জীবন! জলে, স্থলে কোথায় নেই তিনি?— মুঠো করে ধরে রাখতে পারি, তেমন সাধ্য কি আমার?

গানটা তাঁর জীবনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। খেয়াল শিখেছেন রীতিমতো ওস্তাদের কাছে। গান নিয়ে যে কত প্রসঙ্গ এসেছে আড্ডায়! কখনও কখনও গেয়েও শুনিয়েছেন। একদিন কোথা থেকে এক সঙ্গে ফিরছি। বললেন, এই গানের জন্যেই পিএইচডি-টা করা হলো না। গোটা শীতটাই তো উচ্চাঙ্গ সংগীতে কলকাতা জমজমাট! নিতাইদা, সেতারী নিতাই বসুর সঙ্গে বসে গেলে তো কথাই নেই। কত গম্ভীর আলোচনা, সে তো গান নিয়েই নয়, জগৎ ও জীবনের অখণ্ড সাঙ্গীতিক ঐকতানেও তাঁরা নিবিষ্ট হয়ে উঠতেন। একদিন মনে আছে মোহন কাননে (পাইকপাড়া অঞ্চলের) একটা অনুষ্ঠান হল (কুমার বোসের তবলাও ছিল সেদিন), দিলীপবাবু সামনে বসে। বললেন, নিতাইবাবু, সব শেষে একটু লচাও ঠুংরিটা যদি বাজান। নিতাইদা সেদিন লচাও ঠুংরির গৎ বাজিয়ে আমাদের মোহিত করে দিয়েছিলেন।

এরপরই শুরু হলো তাঁর বিচার বিশ্লেষণ। পরের আড্ডায়। ওই জায়গাটায় ভাবো তো নিতাইবাবুর সুরটাকে— না না, ওটা ওখানে ঠিকই আছে, আর হবেই বা কি করে, সেতারে তো ওই জায়গাটা ঠিক আদায় হবে না, আহা হতো যদি এস্রাজ তাহলে জমে যেত ঠিক! এ তো গণপত রাও ভাইয়ার আশ্চর্য সৃষ্টি! বলতে পার ধ্রুপদের কাছ থেকে ধার করে নেওয়া

অতি সূক্ষ্ম কারুকাজে ঠাসা একটা বিলম্বিত গমনভঙ্গীর বস্তু। মুখের ধরতাই থেকে পংক্তিটি এমনভাবে বাঁক নেবে, তারপর যেন লীলাভরে এগোতে এগোতে প্রতি মাত্রায় সুরের ঐশ্বর্য প্রকাশ করবে, সে কি কম রাজকীয়? আর কি রঙদার! প্রথম একটা রঙ ভেসে উঠলো, পরক্ষণেই আবার আর একটি রঙের স্তর এসে চোখ ভাসিয়ে দিল, তারপর একের পর এক রঙের ছায়া তুলতে তুলতে শেষে রামধনু হয়ে প্রকাশ পেল ঠুংরি। ঠেকা-ও বিলম্বিত, যৎ বা আধ্যায়ী বেশির ভাগ। এছাড়াও কতকগুলি ঠেকা উদ্ভাবিত হয়েছিল। এই লচাও ঠুংরির অদ্বিতীয় শিল্পী হলেন মউজুদ্দিন খাঁ। এরপরই তিনি তালিকা দাখিল করতে লাগলেন। দেখ, বাঈজীদের মধ্যে গহরজান, দুই মালকা, জদ্দন বাঈ, বেনারসের বড়ি মোতি বাঈ, রসুলন বাঈ, সিদ্ধেশ্বরী বাঈ, তাঁর মেয়ে গিরিজা বাঈ, উসনাজান প্রমুখ অনেকে। স্যার এই জায়গাটায় এলে কথা বলতেন একেবারে ঝর্ণার মতো। তারপর শুরু হতো এই বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত ভাষ্য।

দিলীপবাবু যখন কৃষ্ণনগর কলেজে ছিলেন, তখন অমিয়নাথ সান্যালের বাড়িতে তাঁর খুব যাতায়াত ছিল। অমিয়নাথের কাছে তিনি এই গানটি একবার শোনান 'এবার অবগুণ্ঠন খোল—'। খুব কৌতূহলী হলেন অমিয়নাথ। বললেন, নিরিবিলিতে বসে আমি গানটা একবার বিশ্লেষণ করে দেখবো। পরে দেখা হলে তার আরোহণ ও অবরোহণ (যেটাকে এঁদের ভাষায় 'পকড়' বলে) দেখিয়ে বললেন, কি আশ্চর্য দেখেছেন, এ গানটার সরগম বিশ্লেষণ করে আমাকে এর রাগরূপ নির্ণয় করতে হলো। এ তো এক বিশেষ ধরনের মল্লার, যা একালে শোনাই যায় না প্রায়! 'চরজু কি মল্লার।' বললেন বদল খাঁ-র কাছে এই রাগের একখানা গান তিনি পেয়েছিলেন। রাগটি পরে বদল খাঁ-রই আর এক শিষ্য ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এক ঘরোয়া আসরে শুনে স্যার মোহিত হয়েছিলেন। গানটির প্রথম পংক্তি ছিল 'আজু ঝরলায়ো'। অমিয়নাথ সান্যাল কবির অনুরোধে একবার গান গেয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। কবির মন্তব্য ছিল, 'ভয় পেয়েছিলুম অমিয় বুঝি ওস্তাদ। অশিক্ষিত লোক ওস্তাদকে বরাবর ভয় করে। কিন্তু দেখছি ও হলো শিল্পী।'

একদিন কেসর বাঈ-এর কথা উঠলো। বললেন, ওহ্, সেবার ওঁর কণ্ঠে দেশ রাগ যা শুনেছিলাম তা বোধহয় আর কারও কাছে শুনিনি। জমে গিয়েছিল খুব। জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ডিকশন লেন-এর বাড়িতে মহফিল বসেছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ বি.এম. সেনকে সভাপতি ক'রে নিয়ে গিয়েছিলাম।

সেন মশাই কিছুতেই যেতে চান না, বলেন আমি গানের কিছু বুঝি না, কি যাব? যাই হোক শেষ পর্যন্ত গেলেন। পরে গান শুরু হতে দেখি একটু বাদে কারও আর হুঁস নেই। মায় বি.এম. সেন পর্যন্ত। সবাই যেন একভাবে দুলছেন। একটা কি যেন হয়ে গিয়েছিল।

ফৈয়াজ খাঁ একবার মিঁয়া কি মল্লার গেয়েছিলেন মহাজাতি সদনের এক অনুষ্ঠানে। স্যার বললেন, যেই সুর ধরেছেন, পিছনের দিকে ছেলেছোকরার দল একযোগে তাঁকে দেখবার আগ্রহে একটা বেঞ্চিতে উঠতে গেল এবং যথারীতি বিকট আওয়াজ ক'রে সেই বেঞ্চিটা ভাঙলো। ফৈয়াজ সাহেব থেমে গেলেন। সবাই তো তটস্থ! খাঁ সাহেব ধীরে ধীরে একটা সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'দেখো কি অবস্থা! স্বয়ং তানসেন যখন

এই মিঁয়া কি মল্লার ধরতেন, তখন বৃষ্টি এসে যেত। আর আমার কণ্ঠ কতই তুচ্ছ যে আমি মিঁয়া কি মল্লার ধরলে বেঞ্চি ভাঙার আওয়াজ হয়।

দিলীপকুমার রায়ের কথা একদিন উঠেছিল। বড় সুন্দর গলা ছিল তাঁর। কিন্তু কোনওদিন কোনও ওস্তাদকে নিয়ে উনি থিতু হননি। সান্যালমশায় একবার ওঁকে শ্যামলাল খেত্রীমশায়ের কাছে নিয়ে যান। ওই একদিনই। তারপর আর দিলীপ রায় ওমুখো হননি। এইটা উনি বারবারই করতেন।

দিলীপবাবুর পিতামহ দ্বিজদাস (১৮৬০-১৮৯২) যে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন তা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবেই। এজন্য শান্তিপুরের বাসভুমি থেকে তিনি বিতাড়িত হন। পোস্টাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন দিলীপবাবুর পিতা জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের (১৮৮৮-১৯৬৫) বয়স মাত্র চার বছর। দ্বিজদাসের স্ত্রী গিরিবালা এক পুত্র ও ছয় বছরের এক কন্যা নিয়ে অকুল পাথারে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে দ্বিজদাস শিবনাথ শাস্ত্রীকে অনুরোধ ক'রে যান তাঁর পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করতে। গিরিবালা সেলাই ফোঁড়াই ও ফুলের সাজি তৈরি ক'রে খানিকটা সামাল দিতেন। বাংলা ও ইংরেজি পড়াতেন ছেলেমেয়েদের। শাস্ত্রীমশায়ও তাঁর দায়িত্ব পালন করতেন।

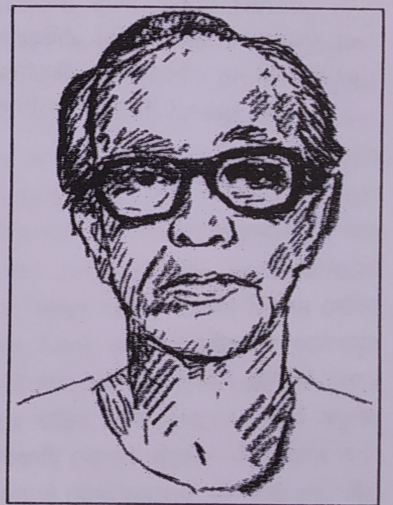

দিলীপকুমার বিশ্বাস শিল্পী : প্রকাশ দাশ

দিলীপবাবুর জন্ম ৭ জুলাই, ১৯২০-তে কটকে তাঁর মামাবাড়িতে। মা নর্মদা কর (১৮৯২-১৯৮৪) পড়াশুনা করেছিলেন কলকাতার বেথুন কলেজে (১৯১০-১৯১৪)। মা ছিলেন ওড়িশার বিখ্যাত বাগ্মী বিশ্বনাথ করের (১৮৬৪-১৯৩৪) সন্তান। বিশ্বনাথ কটকে *প্রবাসী* পত্রিকার সমতুল্য উৎকল *সাহিত্য*-র সম্পাদক ছিলেন। বাবা জিতেন্দ্রনাথ প্রথমে ওকালতি শুরু করেন ওড়িশার শোনপুর স্টেট-এ বিজয়চন্দ্র মজুমদারের কাছে। অবিভক্ত বঙ্গে পরে বিচারক হিসাবে যোগ দেন। যেজন্য মাঝে মাঝেই তাঁকে স্থানান্তরিত হতে হতো। তাই পূর্ববঙ্গের পর তাঁর বাবা তমলুকে চলে এলে তিনি তমলুক হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। পড়েন ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ পর্যন্ত। স্কুলে সহপাঠী হিসাবে পান অমলেশ ত্রিপাঠীকে। পরে বাবা বরিশালে চলে যাবার সুবাদে আর এই স্কুল থেকে পরীক্ষা দিতে পারেননি। পিরোজপুর সরকারি স্কুলে তাঁর সহপাঠী হলেন অরুণ রায়চৌধুরী, যিনি ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর অগ্রজ। এখান থেকেই ১৯৩৬ সালে তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন (১৯৩৪-১৯৩৬), তারপরই চলে আসেন কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হতে। তাঁর এই কলেজে পড়বার সময়কাল হলো ১৯৩৬ থেকে ১৯৪০ পর্যন্ত। এরপর পড়লেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯৪০-১৯৪২)।

কাদের পেয়েছেন শিক্ষক হিসাবে? প্রেসিডেন্সিতে ইংরেজিতে প্রফুল্ল ঘোষ, সুবোধ সেনগুপ্ত, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার ব্যানার্জী; বাংলা ও সংস্কৃততে প্রধান রাধাগোবিন্দ বসাক, শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য (ইনি অঙ্ক ও ইংরেজিতেও অসাধারণ ছিলেন); বাংলা ও তুলনামূলক দর্শনে গৌরীনাথ ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, শশাঙ্কশেখর বাগচী; ইতিহাসে প্রধান ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন, সুশোভন সরকার, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, সুরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার; দর্শনে প্রধান প্রভু দত্তশাস্ত্রী (ইনি রাজশাহী কলেজেও ছিলেন), ড. নলিনীকান্ত ব্রহ্ম, মহেন্দ্রনাথ সরকার, আবু সঈদ আইয়ুব (মহেন্দ্র সরকার বিলেতে গেলে তাঁর ছুটিজনিত শূন্যস্থানে আসেন)। সিভিক্স পড়াতেন ড. যোগেশচন্দ্র সিংহ, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল (জুনিয়র)। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন ইতিহাস বিভাগের প্রধান ছিলেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (ভাণ্ডারকরের পর), হেমচন্দ্র রায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, বিনয়চন্দ্র সেন, দীনেশচন্দ্র সরকার (বয়সে তখন সকলের চেয়ে ছোট), কালিদাস নাগ (স্যার-কে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন), স্টেলা ক্রামরিশ, জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী (হেমবাবুর পর তিনি কারমাইকেল প্রফেসার হন, এঁর কাছে স্যার পিএইচডি শুরু করলেও পরে ছেড়ে দেন), সরসীকুমার সরস্বতী, নীহাররঞ্জন রায় (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক হলেও ক্লাস নিতেন)। এছাড়া যাঁরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য ক্লাস নিতেন, তাঁরাও, যেমন ড. ই.এন. ঘোষাল, ড. রাধাগোবিন্দ বসাক ও কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী। পালি-তে ছিলেন বেণীমাধব বড়ুয়া, নলিনাক্ষ দত্ত, ফাইন আর্টসে ছিলেন দেবপ্রসাদ ঘোষ এবং শাহেদ সুরাবর্দিও। শেষোক্ত অধ্যাপক স্প্যানিশ এবং রাশিয়ানও পড়াতেন।

যাঁদের কাছে পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে তাঁর কাছে সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছেন, যাঁরা অদ্ভুত ভালো পড়াতেন। এঁরা হলেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, সুশোভন সরকার, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ ও শিবপ্রসাদ ঘোষ। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃতে শ্রীমোহন তর্কবেদান্ততীর্থের কাছে পরবর্তীকালে পড়েছেন শাঙ্করভাষ্য সহ বৃহদারণ্যক উপনিষদ, বেদান্ত পরিভাষা, বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহ। ইনিও তাঁর মতে, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ছিলেন।

সহপাঠী হিসাবে পেয়েছেন অমলেশ ত্রিপাঠী, সত্যজিৎ রায়, প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রমুখকে।

ওঁর একটা কথাই ছিল যে উনি ব্রিটিশের চাকরি করবেন না। তাই শান্তিনিকেতনে সহকারী গ্রন্থাগারিক হিসাবে যোগ দেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়। গ্রন্থাগারিক ছিলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। সেসময় পেয়েছেন রামকিঙ্কর বেজ, নন্দিতা কৃপালনি, রানী চন্দ ও দিনকর কৌশিককে।

বিয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় সরাসরি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন। কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ হয়, সদস্য না হয়েও দিলীপবাবু উদয়ন চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে তাঁদের হয়ে কাজ করতে থাকেন। প্রথমে *ফ্রি ইন্ডিয়া* বুলেটিন নামে দু-আনার একটি পত্রিকা তিনি ডালহৌসি স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে বিক্রি করতেন। পরে গুপ্ত আন্দোলনে চলে যান। স্বাধীন ভারতের (নিষিদ্ধ) প্রথম বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করতেন ইংরেজি অনুষ্ঠান ৪১/৬৮ মিটার ব্যান্ডে। এটি ছিল রামমোহন লোহিয়ার পরিকল্পনা। রাত ৯টা থেকে শুরু হতো অনুষ্ঠান This is a Congress Radio Calling. Hallo every-

body! Here is the news। বলতেন তিনি, আর সে খবর শোনা যেত উত্তর ভারত, এমনকি আবহাওয়া অনুকূল থাকলে বর্মা দেশ থেকেও। সাবোটাজ-এর খবর থাকতো। প্রথমদিকে ৯টা থেকে ৯টা ১৫, এবং পরে জনপ্রিয় হবার পর অনেকক্ষণ চলতো। এটা চালাতেন। ধরা পড়ার ভয়ে এক একদিন এক এক জায়গা থেকে সম্প্রচার হতো। একদিন তো বরানগরের দিকে বোমাবর্ষণ হয়, তাঁরা একটা হোসপাইপের মধ্যে শুয়ে কাটান। ধরা কখনও পড়েননি, কিন্তু পুলিশ তাঁকে সন্দেহ করে শেষের দিকে। লর্ড সিন্‌হা রোডে ডাকাডাকি শুরু হলো। কিন্তু তখন স্বাধীনতা প্রায় সমাসন্ন।

আড্ডার কথাই বলতে পারি। তাঁর ভাণ্ডারে কত যে গল্প, পুরোনো ভুলে যাওয়া প্রসঙ্গ ও স্মৃতিকথন ঘুরে ফিরে এসেছে, যা তাঁর শৈশবের, যৌবনকালের বা আরও কত প্রাচীনকালের জানা-না-জানা কথার সঙ্গে আমাদের উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে।

একদিন ক্ষিতিমোহন সেনের কথা উঠলো। বললেন, আমরা যখন অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধায় ছিলাম, ক্ষিতিমোহন সেন একবার সাতদিন এসে আমাদের বাড়িতে ছিলেন। আগে থেকেই লিখে পাঠিয়েছিলেন, যেতে পারি, কিন্তু আমার জন্যে রোজ বেলের বন্দোবস্ত রাখা চাই, ওটা ছাড়া আমার চলে না। এখান ওখান থেকে বেল সংগ্রহ করা হলো। আমরা বালকরা তো ওঁর ফাই-ফরমাশ খাটতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যেতাম। তা বেলের ওপরের খোলাটাও তিনি ভিজিয়ে রাখতে বলতেন। খোলা নরম হয়ে গ'লে জলের সঙ্গে মিশে গেলে পরদিন উনি খেতেন। ১৯৪৪-এ দিলীপবাবু শান্তিনিকেতনে যান সহকারী গ্রন্থাগারিকের পদে কাজ করতে। সে সময়ও ক্ষিতিমোহনকে তিনি পান সেখানে। বলেন, ওখানে চা-চক্রে বিকেলবেলা আমাদের আড্ডা হচ্ছে, তখন কতই বা আমার বয়স! আড্ডায় ছিলেন সেদিন অনিল চন্দ, ক্ষিতীশ রায়, আরও কেউ কেউ—এবং তৎসহ জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়। জ্ঞানবাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি প্রচণ্ড সিগারেট খেতেন এবং সেই সঙ্গে প্রবল কাশতেন। এইসবই চলছে তখন, সেসময় ক্ষিতিমোহন বিদ্যাভবন থেকে নেমে বাড়ির দিকে চলেছেন। গায়ে ফতুয়া, পরনে ধুতি এবং কাঁধে একটি ঝোলা। সেসময় ওইরকমই পোশাক ওঁদের,—বিধুশেখর শাস্ত্রী মশায়েরও ওইরকম পরিচ্ছদ ছিল। ক্ষিতিমোহন সকলকে দেখে বললেন, কি হচ্ছে সব, অ্যাঁ, চা খাওয়া হচ্ছে বুঝি, ইত্যাদি। জ্ঞানবাবু তো ওঁকে দেখতে পেয়েই সিগারেটটি ফেলে দিয়েছেন আর গালমন্দ করছেন, অবশ্য অতি মার্জিত ভাষায় এবং নিচু গলায়। কিন্তু ওই ৫৫৫ সিগারেটের টিনটা কোথাও সরাতে না পেরে পিঠে লুকিয়েছেন। ক্ষিতিমোহন ওই অবস্থায়ই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলেন। জ্ঞানবাবুও কথা বলছেন আর সিগারেটের কৌটোটি পিঠের দিকে ক্রমাগত ঠেলে চলেছেন। তারপর ক্ষিতিমোহনবাবু যথারীতি চলে গেলেন, কিন্তু মাঠে নামবার আগেই হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। পিছন দিকে ফিরে বললেন, জ্ঞান, তুমি যে বস্তুটি ওখানে লুকিয়ে রেখেছ সেটা কিন্তু তোমার কাশির ওষুধ নয়। জ্ঞানবাবু থমকে গেলেন। তারপর ক্ষিতিমোহন দূরে চলে যেতেই আবার তাঁর গালমন্দ শুরু হলো।

আর একদিনের কথা। *মডার্ন রিভিউ*-র প্রসঙ্গেই সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের কথা উঠলো। বললেন, একবার লীগ অব নেশনস থেকে প্রস্তাব এসেছিল তিনি তাঁদের অর্থে তাঁদের ওখানে ঘুরে এসে তাঁদের সম্পর্কে প্রতিবেদন লিখবেন। রামানন্দবাবু বললেন গেলে

আমি নিজের অর্থেই যাবো। তা না হলে নিরপেক্ষভাবে লিখতে পারবো না। গিয়েছিলেনও। উঠেছিলেন রজনীকান্ত দাসের বাড়ি। এঁরা আবার নিরামিশাষী ছিলেন। সুতরাং ওঁর বাড়িতে শাকপাতা খেয়ে রামানন্দবাবুর নিমোনিয়া হয়ে গেল। যাহোক চিকিৎসায় ভালো হলেন এবং দেশে ফিরে এসে লিখলেনও।

আচার্য যদুনাথ সরকার রাজশাহীর মানুষ ছিলেন। বললেন, একদিন শিয়ালদার রাস্তার দিকে হাঁটছি, দেখি উনি পাঁঠার মাংসর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মাংস কিনছেন। দেখা হতে কথা বলতে শুরু করলেন। কেউ ওঁর কাছে গবেষণা করতে চাইলে আগে জিজ্ঞেস করতেন আরবি ফার্সি জানে কি না। না জানলে শিখে তবে আসতে বলতেন। স্যার বললেন, রায়টের সময় ওঁর বড় ছেলেটি খুন হয়। সে কি অবস্থা! সুনীতিবাবু ও নীহাররঞ্জন রায় ছুটে গেলেন স্যারের সঙ্গে দেখা করতে। গিয়ে দেখলেন যদুনাথ তাঁর গ্রন্থাগারের এককোণে বসে একটা বই থেকে কিছু একটা টুকে নিচ্ছেন। ওঁরা গিয়ে পড়লেন সেখানে, স্যার আপনি এখনও এখানে। যদুনাথ চেঁচিয়ে বললেন, তাহলে আমাকে কি করতে বল? আমি বসে বসে মাথার চুল ছিঁড়বো?

শিয়ালদার কথা উঠতে মনে পড়লো, একদিন তিনি অমনভাবেই হেঁটে আসছিলেন, হঠাৎ সামনে এসে পড়লো একটা ঘোড়ার গাড়ি। দরজা খুলে গেল। দেখলেন রথী ঠাকুর। দিলীপবাবু, নমস্কার। হাতজোড় করে নমস্কার করলেন রথীবাবু স্যারকে। এতই ভদ্রতাবোধ ছিল ঠাকুরবাড়ির।

১২ ডিসেম্বর ১৯৯৩ রবিবারের কথাটা কোনও একটা কারণে আমার মনে আছে। সাহিত্য অকাদেমির এক আমলা আমাকে বলেছিলেন যে ফকিরমোহন সেনাপতির বংশের কেউ একজন আত্মচরিতের যে বঙ্গানুবাদ করেছিলেন তা নাকি অতি প্রামাণ্য। কথাটা স্যারকে বলতেই বললেন, অনুবাদটি মোটে ভালো হয়নি। মূলের Force কোথায়? *আলেখ্য* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ওই বইয়ের অনুবাদ করেছিলেন স্যার স্বয়ং ওই একই বছরে। শেষ হওয়ার আগেই পুলিনবাবুকে (পুলিনবিহারী সেন) ধরে কাজটি হস্তগত করা হয়। পুলিনবাবু পরে বলেছেন যে ফকিরমোহনের বংশধর, তাই আর আপত্তি করিনি। উনি জানতেন না যে অনুবাদটি দিলীপবাবু করেছিলেন। অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন, দিলীপই ছিল এই অনুবাদের যোগ্য ব্যক্তি। সে তো অনুবাদ ক'রে প্রকাশই করছিল। কাজটা ওকে দেওয়া হলো না কেন? শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় দিলীপবাবুকে বইটার একটা রিভিউ লিখতে দিয়েছিলেন, সেটা অবশ্য তিনি ক'রে দেন। কথা প্রসঙ্গে স্যার বলেন, ফকিরমোহনের ভাষা 'গড়জাত' এলাকার ভাষা। গড়জাত এলাকা পাহাড়ি ও জঙ্গলাকীর্ণ ব'লে ওখানে মুসলমানরা পর্যন্ত ঢুকতে পারেনি। তাই তার ভাষা অতি archaic features-এ সমৃদ্ধ। 'আপনি বিজে করিবেন কি?' 'বিজে করা' মানে যাওয়া। ওখানে ভুল অনুবাদ করা হয়েছিল। অনুবাদিকা 'উপস্থিত কবি'কে 'আধুনিক কবি' ব'লে চালালেন কিভাবে? ওড়িয়ায় মূলে 'উপস্থিত কবি' শব্দটা বাংলারও। ওখানে সেই 'লজ্জাবতী গন্তং নেচ্ছতি' এই সংস্কৃত শ্লোকের পর তিনটি চরণ কবি পূরণ করে দিচ্ছেন, এ দেখেও তাঁর ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল। দিলীপবাবুর মাতামহ বিশ্বনাথ করের সঙ্গে ফকিরমোহন সেনাপতির সখ্য ছিল খুব। দিলীপবাবুর মা যখন বেথুন কলেজে পড়তেন, তখন ফকিরমোহন তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন কলকাতায় এসেই। বলতেন, তুমি আমাদের দেশের

লোক। তোমাকে দেখে যাওয়া আমাদের কর্তব্য। ফকিরমোহন পুত্রবধূও এনেছিলেন এক ব্রাহ্মকন্যাকে।

এই ফকিরমোহন বালেশ্বরে নুনের জাহাজের পাল তৈরির ঠিকাদারী করতেন। সেসব অভিজ্ঞতায় তাঁর *আত্মচরিত* সমৃদ্ধ। এর আগে পর্যন্ত কিন্তু তাঁর সাহিত্য রচনা বাংলায়। স্যার বললেন, জান, অন্নদাশঙ্করের প্রথম দিকের লেখা কিন্তু সব ওড়িয়ায়। *উৎকল সাহিত্য*-তে লিখতেন। বিশ্বনাথ করকে একদিন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছেন স্যুট বুট পরা অন্নদাশঙ্কর, এমনটিও তিনি ছেলেবেলায় দেখেছেন। দেখে তিনি নাকি তাঁর মাকে বলেছিলেন, 'মা দেখ দেখ সায়েব এয়েচে'। অন্নদাশঙ্কর তাঁর *সত্যাসত্য* উপন্যাসের নায়কের নাম রেখেছিলেন স্যারের ডাক নাম নিয়েই 'বাদল'। ফকিরমোহনের বাগান করবার খুব সখ ছিল। কটকে তিনি যে বাড়িতে থাকতেন তার সঙ্গে লাগোয়া একটা সুন্দর ফলের বাগান ছিল। এছাড়া বালেশ্বরে তাঁর পৈতৃক বাড়িতেও খুব বড় ফলের বাগান ছিল। একটা হাউসকোট প'রে উনি থাকতেন। পকেটে থাকতো অনেক ফল। বাচ্চারা সব ওঁর চারপাশে ঘুরঘুর করতো। ফট করে হাত বাড়িয়ে উনি কাউকে হয়তো দিলেন একটা পেয়ারা, কাউকে বা আম। স্যার একদিন বলেছিলেন, তাঁর *আত্মচরিত*-এ ভাষা যেন একেবারে জীবন্ত। অশ্লীল শব্দেরও ব্যবহার আছে প্রয়োজনমতো। চতুর্ভানীর হিন্দি অনুবাদক বাসুদেব শরণ আগরওয়াল তো তাঁর অনুবাদের জন্য রীতিমতো বেনারসের আন্ডারওয়ার্ল্ড-এর ভাষা শিখেছিলেন। ফকিরমোহন বালেশ্বরে নুনের জাহাজের পাল তৈরির ঠিকাদারী করতেন। ফলে পালের যে কাপড়, সেই কাপড় মেরামত করা বা নতুন পাল লাগানো, সাধারণ মানুষের কথাবার্তা— এই সমস্ত অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়েই কিছু অপশব্দ এসে গেছে বইটিতে। বলতেন ফকিরমোহন—'He even transcends our Bankimchandra....'।

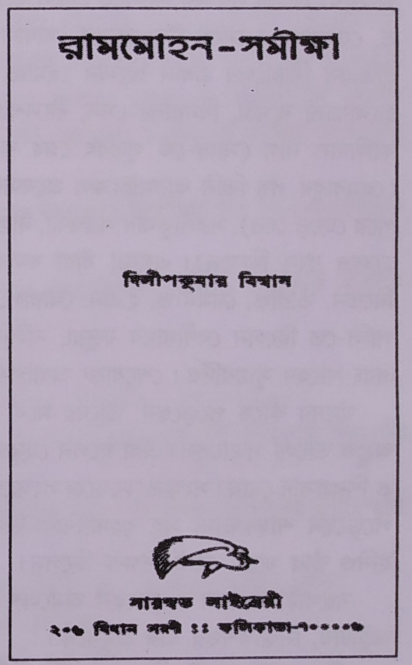

এরকম কত শত কাহিনী, কত চিহ্ন দিয়ে ঘিরে রাখা আছে তাঁর ব্যক্তিত্ব আমার মনে। এক এক প্রসঙ্গে এক এক রকম উপদেশ দিতেন, একটু খুব সামান্য ব্যাপারে ব্যথিত হয়েছিলাম, বলেছিলেন, ছোট ছোট কথা কখনও ধরবে না। এমন আঙ্গিকে বললেন, মনে গেঁথে গেল। যেমন সৌম্যদর্শন, তেমনই সৌম্য মনের অধিকারী ছিলেন। কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না, নিছক অপ্রিয় কিছু হলে এড়িয়ে যেতেন। সূর্যোপাসনা নিয়ে তখনকার কারমাইকেল অধ্যাপক জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে গবেষণা করতে শুরু করেন। ১৯৪২-এ আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে থেকে পঁচাত্তর টাকা জলপানি পান। কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় সে গবেষণা আর

করেননি। কথাটা অন্যত্র শুনেছি, তাঁর মুখে কখনও নয়। আমরা যারা আজ শিল্প ও জীবনের দ্বন্দ্বে বেদনাদায়ক জীবন কাটাচ্ছি, আমাদের কাছে তিনি ছিলেন আত্মার আরাম, মনের আশ্রয়। কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন ও সমস্যা নিরসনে তিনি যেমন সহায় ছিলেন, তেমনি সমস্ত ব্যাপারেই তিনি ছিলেন যথোচিত নিরপেক্ষ, নিস্পৃহ ও অনন্যমনা। কারও দ্বারা প্রভাবিত হতেন না, যার ফলে তাঁর দেওয়া উপদেশ অসম্ভব প্রত্যয় ও অদম্য প্রেরণা গড়ে তুলতো। একেবারে জীবনের শেষ দিকে কথা বড় কমে যাচ্ছিল। একদিন বললেন, 'আমাকে আমার বাবা আর মা যেন ঘিরে রেখে দিয়েছেন।' বুকটা ছ্যাঁৎ ক'রে উঠেছিল। তাঁর ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিকতার কথাটা বলার ইচ্ছা ছিল। ব্রাহ্ম ছিলেন বাইরের দিক থেকে অবশ্যই, কিন্তু তিনি কোনও বিশেষ ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন না। তাঁর ধর্ম ছিল তাঁর নিজেরই অনুভূতি। অনেক সময় বাড়িতে গিয়েছি, দেখেছি জানলার দিকে মুখ ক'রে উপনিষদের শ্লোক আবৃত্তি করছেন, কখনও বা রবীন্দ্রনাথের *জন্মদিনে* কাব্যগ্রন্থের এই কবিতাটি—

বারবার মনে মনে বলিতেছি, আমি চলিলাম
যেথা নাই নাম,
যেখানে পেয়েছে লয়
সকল বিশেষ পরিচয়
নাই আর আছে
এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে,
যেখানে অখণ্ড দিন
আলোহীন, অন্ধকারহীন।
আমার আমির ধারা মিলে যেথা যাবে ক্রমে ক্রমে
পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসঙ্গমে।

অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাসের জীবনপঞ্জি

— জন্ম ৭ জুলাই, ১৯২০, বাংলা ২২ আষাঢ়, ১৩২৭, কটক, উড়িষ্যা।

—বাবা জিতেন্দ্রকুমার বিশ্বাসের পিতৃবিয়োগ হয় জিতেন্দ্রকুমারের চার বছর বয়সে। প্রথম জীবনে ওকালতি করেন, পরবর্তীকালে বিচারপতি হন।

—মা নর্মদা-র পিতা ছিলেন বিশ্বনাথ কর, প্রখ্যাত *উৎকল সাহিত্য* পত্রিকার সম্পাদক।

—অধ্যাপক বিশ্বাসের প্রথম স্কুলজীবন শুরু হয় তমলুকের হ্যামিলটন স্কুলে। পঞ্চম শ্রেণী থেকে চার বছর এই স্কুলে পড়েন (১৯২৯-১৯৩৩)। চাকরিজীবনে বাবার স্থানান্তরণের সুবাদে পরের বছর পূর্ববঙ্গের বরিশালে পিরোজপুর গভর্নমেন্ট স্কুলে ভর্তি হন ও ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ১৯৩৬-এ এই স্কুল থেকে।

—প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন ১৯৩৬-এ। ১৯৩৮-এ ইন্টারমিডিয়েট ও পরে বি.এ. অনার্স সহ পাশ করেন ১৯৪০-এ। ১৯৪০ থেকে ১৯৪২ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ।

—১৯৪২-এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেন। ছাত্র সংগঠন ও কিছু দিন গুপ্ত আন্দোলনেও ছিলেন। স্বাধীন ভারতের (নিষিদ্ধ) প্রথম বেতার কেন্দ্র পরিচালনা করতেন ইংরেজি অনুষ্ঠান ৪১/৬৮ মিটার ব্যান্ডে।

—১৯৪৪-এ শান্তিনিকেতনে সহকারি গ্রন্থাগারিক হিসাবে রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অধীনে বিশ্বভারতীতে যোগ দেন।

—১৯৪৫ থেকে ১৯৪৭ সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন।

—দেশ স্বাধীন হলে ১৯৪৮-এ অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্তের সভাপতিত্বে সরকারি কলেজ ছেড়ে চলে যাওয়া বহু মুসলমান অধ্যাপকের অভাব পূর্ণ করবার জন্য Education Partition Council স্থাপিত হয়। সুবোধ সেনগুপ্তের সুপারিশে তিনি সরকারি কলেজে যোগ দেন।

—১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ কৃষ্ণনগর কলেজ। দার্জিলিং কলেজে ১৯৫১-১৯৫৪। ১৯৫৪-তে গেলেন কুচবিহার কলেজে। কুচবিহার কলেজে রইলেন ১৯৫৪-১৯৫৫। এবার আবার এলেন কৃষ্ণনগর কলেজে। রইলেন ১৯৫৫ থেকে ১৯৫৭ পর্যন্ত। ১৯৫৮-র জানুয়ারিতে এলেন প্রেসিডেন্সিতে। টানা ১১ বছর থেকে প্রফেসর পদ পেলেন। ১৯৬৯-এ সংস্কৃত কলেজের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রধান হলেন।

—সংস্কৃত কলেজ থেকে অবসর নেন ১৯৮২-তে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন আংশিক সময়ের অধ্যাপক (১৯৬০-১৯৮৪)।

—১৯৮৫-তে এশিয়াটিক সোসাইটিতে Oriental Studies-র অতিথি অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন। অধ্যাপনা করেন ১৯৮৭ পর্যন্ত।

—ব্রাহ্মসমাজে সভাপতি ছিলেন (১৯৭০-১৯৭৫)।

—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সম্পাদক ১৯৭০-১৯৭৫। সভাপতি ১৯৯০-১৯৯৫।

—এশিয়াটিক সোসাইটিতে ১৯৯৭-১৯৯৮ এবং ১৯৯৮-১৯৯৯—এই দুটি কালক্রমে সভাপতি ছিলেন।

—১৯৯৪-তে *রামমোহন সমীক্ষা* নামক গবেষণাগ্রন্থটির জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার পান।

—১৯৮৪-তে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী বসু স্বর্ণপদকে ভূষিত করে।

—১৯৮৫-তে পান কালিদাস নাগ মেমোরিয়াল পুরস্কার।

—২০০০-এ পান হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী শতবার্ষিকী স্বর্ণপদক।

—২০০০-এ পান Honourary Fellowship of The Asiatic Society.

—২৩ নভেম্বর ২০০৩, মৃত্যু ভোর ৪-৩৫-এ উত্তর কলকাতার চেয়ারিং ক্রস হাসপাতালে।